অ্যানথ্রাক্স রোগ, লক্ষণ ও প্রতিকার

অ্যানথ্রাক্স গবাদিপশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গবাদিপশু থেকে এ রোগে মানুষেও ছড়ায়। এ রোগের জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য খেয়ে বিশেষ করে বর্ষাকালে নদী-নালার পানি ও জলাবদ্ধ জায়গার ঘাস খেয়ে গবাদিপশু অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়।

রাতে গোয়াল ঘরে সুস্থ গরু রেখে এসে সকালে গিয়ে যদি দেখা যায় গরু মরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তাহলে যেসব রোগে মারা যেতে পারে বলে মনে করা হয় অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগ তার মধ্যে অন্যতম। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গরু মারা যায়। অনেক সময় লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পরপরই গরু মারা যেতে পারে। চিকিৎসার কোনো সুযোগই পাওয়া যায় না। এমনই ঘাতক ব্যাধি অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগ। অ্যানথ্রাক্স বা তড়কা রোগের ইতিহাস অনেক পুরনো। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৯১ সালেও মিসরে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বলে জানা যায়। শুধু মিসর নয়, গ্রিস, রোম এমনকি ভারতবর্ষেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে এ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকায় ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ার রেকর্ড রয়েছে। এমনকি মাত্র তিন দশক আগে ১৯৭৮-৮০ সালে জিম্বাবুয়েতে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে শুধু পশু নয়, প্রায় দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়, মারা যায় প্রায় ১৫১ জন।

যেসব প্রাণীর এ রোগ হয়: মূলত গরু এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, শূকর, হাতি এবং বানরও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। প্রাণী থেকে মানুষে এ রোগ ছড়ায় বলে একে জ্যুনোটিক ডিজিজও (zoonotic disease) বলে। তাই ভয়ের কারণ একটু বেশি।

কিভাবে ছড়ায় : মৃত বা আক্রান্ত পশুর লালা বা রক্তের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। তা ছাড়া চুল, উল বা অন্যান্য বর্জ্যের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। মৃত পশু পচে গলে মাটিতে মিশে গেলেও হাড় যদি থাকে তবে তা থেকেও ছড়াতে পারে। এ রোগের জীবাণু প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশেও বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে। কখনো এক দশকও। কোথাও একবার এ রোগ দেখা দিলে তা পরবর্তী সময়ে আবারো দেখা দিতে পারে। ট্যানারি বর্জ্যের সঠিক ও সুষ্ঠু নিষ্কাশন এ জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যানথ্রাক্সে মৃত গরুর চামড়া ট্যানারিতে গেলে তা থেকে জীবাণু চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

রোগটি কেন এত মারাত্মক : এ রোগের জন্য দায়ী ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস (Bacillus anthracis) নামের এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া। এই ব্যাক্টেরিয়া বিশেষ ধরনের কিছু টক্সিন বা বিষাণু তৈরি করতে পারে। এ টক্সিন প্রাণীদেহে প্রবেশের দুই থেকে চার ঘন্টার মধ্যে প্রাণীদেহের নিউট্রোফিলকে দুর্বল করে ফেলে। নিউট্রোফিল হচ্ছে এক ধরনের শ্বেতকণিকা যা বাইরের জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। টক্সিন নিউট্রোফিলের ফিলামেন্ট তৈরিতে বাধা দেয়, ফলে নিউট্রোফিল চলৎ-শক্তি হারিয়ে ফেলে। সংক্রমণের স্থানে যেতে পারে না, ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংসও করতে পারে না।

নিউট্রোফিল নিষ্ক্রিয় হওয়ায় ব্যাক্টেরিয়া বাধাহীনভাবে দ্রুত দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ তৈরি করে মৃত্যু ঘটায়।
রোগের লক্ষণ : লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই সাধারণত গরু মারা যায়। তবে লক্ষণ হিসেবে কখনো কখনো গরুর খিঁচুনি, কাঁপুনি দেখা দেয়। শরীরের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়। তাপমাত্রা প্রায় ১০৫-১০৭ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। গরু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গরু মারা যায়। মারা গেলে নাক, মুখ, কান, মলদ্বার দিয়ে কালচে লাল রঙের রক্ত বের হয়। এ রোগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গরু মারা যাওয়ার পরও রক্ত কখনো জমাট বাঁধে না।

লক্ষণসমূহ: ক. অত্যাধিক জ্বর হয় (১০৩-১০৭ ফাঃ);
খ. শ্বাসকষ্ট এবং দাঁত কটকট করে;
গ. শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠে;
ঘ. আক্রান্ত পশু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে;
ঙ. পশুকে কিছুটা উত্তেজিত দেখায়;
চ. পশু নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে;
ছ. খিঁচুনি হয় ও অবশেষে পশু মারা যায়;
জ. মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা পরে পশুর নাক, মুখ, মলদ্বার ইত্যাদি দিয়ে কালো রক্ত নির্গত হয়;
ঝ. অনেক সময় লক্ষণসমূহ প্রকাশের আগেই পশুর মৃত্যু ঘটে।

রোগ নির্ণয় : রোগের লক্ষণ দেখে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া রক্ত পরীক্ষা করলে ছোট দণ্ডের মতো ব্যাক্টেরিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এ রোগে মৃত গরুর

ময়নাতদন্ত করা হয় না। তবে ভুলক্রমে ময়নাতদন্ত করে ফেললে দেখা যায় প্লীহা বড় হয়ে গেছে।

চিকিৎসা : সাধারণত চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না, তার আগেই আক্রান্ত গরু মারা যায়। যদি কখনো আক্রান্ত গরু পাওয়া যায় তবে উচ্চমাত্রার পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভ্যাকসিন দেয়াই এ রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। লাইভ এবং কিলড উভয় ধরনের ভ্যাকসিনই পাওয়া যায়। চামড়ার নিচে এ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়। ভ্যাকসিন প্রয়োগের ১০-১৫ দিনের মধ্যেই গরুর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। আক্রান্ত গরুতে আগে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে নতুন করে ভ্যাকসিন দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রতিরোধে যা করণীয় : খুবই ভয়ানক আর ছোঁয়াচে রোগ হওয়ায় এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এ রোগ প্রতিরোধে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো মেনে চলা জরুরি।

১. অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত পশুর ময়নাতদন্ত করা একেবারেই অনুচিত। রোগের লক্ষণ এবং রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই এ রোগ সম্বন্ধে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। ময়নাতদন্তে কাটাছেঁড়া করার জন্য যে ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন দেশের কোনো ল্যাবরেটরিতেই সে ধরনের ব্যবস্থা নেই। কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে পশুর রক্ত, বর্জ্য চার দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আশঙ্কা রয়েছে যারা কাটাছেঁড়া করবেন তাদেরই এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার।

২. পশুর মৃতদেহ ভাগাড়, নদী, জলাশয়, জঙ্গল বা পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলা যাবে না। এতে শেয়াল, কুকুর, শকুনসহ মৃতদেহ ভক্ষণকারী অন্যান্য প্রাণী সেগুলো খাবে এবং রোগজীবাণু চার দিকে ছড়িয়ে যাবে। সেই সাথে বাতাস, পানির মাধ্যমেও গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৩. মৃতদেহ লোকালয় থেকে দূরে জনমানবহীন নির্জন জায়গায় আট-দশ ফুট গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে গর্তে কিছু চুন ছড়িয়ে দিতে হবে। মৃতদেহ রেখে আবার কিছু চুন প্রয়োগ করে মাটি চাপা দিতে হবে। কুকুর, শেয়াল যেন মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য গর্তের ওপর পাথর দিয়ে

রাখা ভালো। গর্তের চার পাশে কাঁটা দিয়ে রাখলে কুকুর, শেয়াল কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

৪. বাড়ি থেকে মৃতদেহ বহন করে নেয়ার সময় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অ্যানথ্রাক্সে মৃত পশুর নাক, মুখ, কান, মলদ্বার দিয়ে রক্ত বের হয়ে থাকে। এ রক্ত আবার জমাট বাঁধা থাকে না। ফলে আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে পারে। তাতে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মৃত পশুর নাক, মুখ, কান, মলদ্বারে তুলা বা কাপড় গুঁজে ভ্যান বা বহনকারী বাহনে উঠাতে হবে। ভ্যান বা অন্য কোনো বাহনে পলিথিন বা অন্য কিছু এমনভাবে দিয়ে নিতে হবে যাতে দুর্ঘটনাবশত লালা বা রক্ত পড়লেও যেন ভ্যান বা বাহনে না লাগে। যারা মৃতদেহ বহন করবে তাদের অবশ্যই দস্তানাসহ বিশেষ ধরনের পোশাক পরা প্রয়োজন।

৫. মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো যাবে না।

৬. আক্রান্ত গরু জবাই করা যাবে না। গোশত না খাওয়াই উত্তম।

৭. আক্রান্ত বা মৃত গরুর গোয়ালঘর ব্লিচিং পাউডার, কাপড় কাচার সোডা বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে যত্নের সাথে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আক্রান্ত গরু সুস্থ গরু থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ আক্রান্ত গরু থেকে জীবাণু সুস্থ গরুতে ছড়াতে পারে। এসব নির্দেশনা সঠিকভাবে মেনে চললে রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

প্রতিকার: ক. গবাদিপশুকে নিয়মিত বছরে একবার অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা দিতে হবে;
খ. পশুর ঘর সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
গ. মৃত পশুর দেহ, গোবর, লালা, প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদিসহ গভীর গর্তে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে;
ঘ. কোনো পশু আক্রান্ত হলে তাকে পৃথক করে চিকিৎসা দিতে হবে;
ঙ. মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো যাবে না;
চ. নদী-নালার পানি ও নিচু এলাকার ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
ছ. অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত পশুর মাংস কোনো অবস্থাতেই খাওয়া যাবে না।

অ্যানথ্রাক্স রোগে মানুষ আক্রান্ত হবার লক্ষণসমূহ : অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গবাদিপশু যারা জবাই করেন, মাংস কাটেন, মাংস ধোয়ামোছা করেন, চামড়া ছাড়ান এবং খান প্রত্যেকেই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। অ্যানথ্র্যাক্স একটি ব্যাকটেরিয়া (ব্যাসিলাস অ্যানথ্র্যাসিস) জনিত সংক্রামক রোগ। রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা দিতে হয়, না হলে প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

কিভাবে ছড়ায় : আক্রান্ত পশুর (গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ) লোম, চামড়া, মাংস রোগ ছড়ানোর উৎস হিসেবে গণ্য করা। এ জন্য রোগে আক্রান্ত পশুর খামারি, লোম উত্তোলনকারী এবং কসাইরা প্রথমে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কখনোই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় না। তবে আক্রান্ত পশুর মাংস ও রক্তের সংস্পর্শে এ রোগ ছড়াতে পারে। তাই রোগাক্রান্ত পশু জবাই বা খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অনুপযোগী।

লক্ষণসমূহ: ক. আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে জ্বর উঠবে;
খ. চামড়ায় প্রথমে লালচে দাগ হবে এবং আক্রান্ত স্থান চুলকাবে;
গ. পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে প্রায় দেড় দুই ইঞ্চি পরিমাণে ফোসকা উঠবে, ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে হবে;
ঘ. ফোসকার স্থানে পরে ব্যথামুক্ত ঘা হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে চিকিৎসা না নিলে মারা যেতে পারে।

জটিলতা : ত্বকে লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করলে এটি সহজে নিরাময়যোগ্য রোগ কিন্তু পরবর্তীতে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়লে এ রোগে মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। ব্যাকটেরিয়াজনিত প্রদাহের কারণে, উঁচু মাত্রার জ্বর, ফুসফুসের সংক্রমণের কারণে তীব্র শ্বাসকষ্ট এবং পরিপাকতন্ত্রের জটিলতার কারণে মৃত্যু হয়ে থাকে।

রোগের ধরন : অ্যানথ্রাক্স জীবাণু মানুষের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রান্ত করতে পারে এবং আক্রান্ত অঙ্গ অনুযায়ী রোগের ধরনও বিভিন্ন রকম হয়। যেমন :

ত্বকের (cuteneous) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশু অথবা এনথ্রাক্স স্পোর দ্বারা দূষিত পশুর পশম, চুল বা চামড়ার সংস্পর্শে এলে অ্যানথ্রাক্স স্পোর মানুষের ত্বকের অতিসূক্ষ্ম ক্ষত দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। এ অবস্থায় সাধারণত ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ত্বকের ক্ষত তৈরি হয়। ক্ষত দুই হাতে মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ঘাড় এবং

মাথাও আক্রান্ত হতে পারে। ত্বকে ধীরে ধীরে ঘা তৈরি হয় যা ২-৩ সেমি আয়তনের হয়ে থাকে এবং ঘা এর চারদিকের ত্বক একটু উঁচু হয়ে থাকে। ক্ষতে চুলকানি থাকে তবে ব্যথা থাকে না।

শ্বসনতন্ত্রির (inhalational) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর স্পোর যদি শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুরুর দিকে হালকা জ্বর, খুশখুশে কাশি এবং বুকে অল্প ব্যথা হয়। পরবর্তীতে তীব্র জ্বর, শ্বাসকষ্ট, শরীর নীল হয়ে যাওয়া, শরীর বেশি ঘেমে যাওয়া, কাশির সঙ্গে রক্ত বের হওয়া, বুকে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

মুখবিবরীয় (oropharyngeal) অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স স্পোর খেলে এ অবস্থা দেখা দেয়। গলাব্যথা, খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া এর লক্ষণ। এক্ষেত্রে মুখের তালু বা মুখবিবরে (pharynx) ক্ষত দেখা দেয়।

পরিপাকতন্ত্রের (Intestinal) অ্যানথ্রাক্স : এটাও অ্যানথ্রাক্স স্পোর খেলে দেখা দেয়। বমি অথবা বমিবমি ভাব, অস্বস্তি, পেটব্যথা, রক্তবমি, বারবার রক্তযুক্ত পায়খানা হওয়ার সঙ্গে জ্বর হয়।

রোগের পরিণতি : বেশির ভাগ এনথ্রাক্স ত্বকের এনথ্রাক্স, যা চিকিৎসা করলে, এমনকি চিকিৎসা না করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যায়। অন্যান্য ধরনের এনথ্রাক্সের পরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ। এর মধ্যে সেপটিসেমিক এনথ্রাক্স এবং অ্যানথ্রাক্স মেনিনজাইটিস এ মৃত্যুহার খুবই বেশি। শ্বসনতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স চিকিৎসা করলেও মৃত্যুহার প্রায় ৪৫%। পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স নির্ণয় করা খুব কঠিন এবং এতে মৃত্যহার ২০-৬০%।

রোগ নির্ণয় : ত্বকের অ্যানথ্রাক্স রোগীর গবাদিপশুর সংস্পর্শে আসার ইতিহাস এবং ক্ষতের ধরন দেখেই বোঝা যায়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্ষত থেকে রস নিয়ে নির্দিষ্ট উপায়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে জীবাণু দেখা যায়। শ্বাসতন্ত্রের রোগ সন্দেহ করলে বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান করা হয়। সেপটিসেমিক অ্যানথ্রাক্স নির্ণয় করার জন্য ব্লাড কালচার করা হয়। মেইনজাইটিস সন্দেহ হলে লাম্বার পাংকচার করে সেরিব্রোস্পাইনাল রস পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া ELISA নামক পরীক্ষাও এ রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা : ত্বকের সংক্রমণের ক্ষেত্রে রোগীকে বহিঃবিভাগেই চিকিৎসা দেওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তির মাধ্যমে চিকিৎসা দিতে হবে। বিভিন্ন রকমের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। কুইনোলন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক যেমন : সিপ্রোফ্লক্সাসিন, লেভোফ্লক্সাসিন, গ্যাটিফ্লক্সাসিন, ডক্সিসাইক্লিন, এমক্সিসিলিন, এম্পিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রতিরোধ : ১. রোগাক্রান্ত পশুকে প্রথমেই আলাদা জায়গায় রাখতে হবে।
২. রোগাক্রান্ত পশুকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
৩. মৃত পশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
৪. রোগাক্রান্ত পশুকে জবাই করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।
৫. রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে যতদ্রুত সম্ভব চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে খামারিদের করণীয়

অ্যানথ্রাক্স সাধারণত দু'রকমের হয়ে থাকে। এর একটি হলো তীব্র প্রকৃতির এবং অপরটি অতি তীব্র প্রকৃতির। তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত প্রাণি প্রায় ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত জীবিত থাকে। জ্বর (১০৪-১০৭০ ফারেনহাইট), ক্ষুধামন্দা, নিস্তেজতা, অগভীর ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদপিন্ডের গতি বৃদ্ধি, পেট ফাপা, দেহের কাঁপুনি, চোখের রক্তাভ পর্দা, রক্ত মিশ্রিত পাতলা মলত্যাগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়। গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত ঘটে। অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বারা রক্ত ক্ষরণও হয়। দুগ্ধবতী গাভী দুধ দেয়া কমিয়ে দেয় ও দুধ হলুদ এবং রক্তমিশ্রিত দেখায়। পাকান্ত্রে আক্রান্তের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া ও ডিসেন্ট্রি দেখা দেয়। চিকিত্সা করা না হলে ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে প্রাণির মৃত্যু ঘটে। অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ প্রকাশের আগেই আক্রান্ত প্রাণির মৃত্যু ঘটে। তবে অনেক সময় ১-২ ঘন্টা স্থায়ী হয়। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সময় পাওয়া গেলে জ্বর, পেশীর কম্পন, শ্বাসকষ্ট, মিউকোসায় রক্ত সঞ্চায়ন ইত্যাদি উপসর্গ থাকে। শেষ পর্যন্ত খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে। মৃত পশুর স্বাভাবিক ছিদ্র দিয়ে বিশেষ করে যোনিমুখ, মলদ্বারা, নাসারন্ধ্র, মুখ ইত্যাদি দিয়ে কালচে রক্ত বের হয়। মৃত্যুর আগে দেহে জ্বর থাকে । প্রধানত তৃণভোজী প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিত্সায় এন্টিসিরাম ও এন্টিবায়োটিক ওষুধ ভালো কাজ করে। এন্টিসিরাম পাওয়া গেলে ১০০-২৫০ মি. লিটার হিসেবে প্রতিটি আক্রান্ত গরুকে নিয়মিত

সিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। তবে এ রোগে পেনিসিলিন বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন চিকিত্সায় অধিক সুফল পাওয়া যায়। প্রতিকেজি দৌহিক ওজনের জন্য পেনিসিলিন সাধারণত ১০০০০ ইউনিট হিসেবে দিনে দু'বার মাংসে ইনজেকশন দিতে হয়। প্রতি আক্রান্ত গরুকে দিনে ৮-১০ মি. গ্রাম/কেজি দৈহিক ওজনে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দু'দিন মাংসপেশিতে ইনজেকশন দিয়ে পেনিসিলিনের চেয়ে বেশি সুফল পাওয়া গেছে।

টিকা প্রয়োগ আক্রান্ত প্রাণিকে চিকিত্সা ও সুস্থ প্রাণিকে টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রস্তুত করে। এ টিকার মাত্রা হলো, গরু-মহিষ ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে ১ মিলিমিটার এবং মেষ, ছাগল ও শুকরের ক্ষেত্রে ০.৫ মিলিমিটার। টিকা প্রয়োগের সময় টিকার বোতল প্রথমে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। পরে জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জের নির্দিষ্ট মাত্রার টিকা নিয়ে প্রাণির ঘাড়ের চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে। আবদ্ধ বোতলে মাটির মধ্যে এ স্পোর ৬০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকার তথ্য রয়েছে। এ রোগের স্পোর সৃষ্টির আগেই মৃত প্রাণির গোয়াল ঘরকে গরম ১০ শতাংশ সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দিয়ে ধুলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটে। তবে স্পোর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ঘন জীবাণুনাশক পদার্থ যেমন—৫ শতাংশ লাইসোল দুদিন বা ফরমালিন বা সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ৫-১০ শতাংশ অথবা পারঅ্যাসিটিক অ্যাসিড ৩ শতাংশে জীবাণুর স্পোরের বিরুদ্ধে কার্যকর। চামড়া ও পশম গামারেডিয়েশন জুতা ও প্লাস্টিকের ব্যাগ ইথাইলিন অক্সাইডে এবং দূষিত কাপড়-চোপড় ১০ শতাংশ ফরমালিনে চুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ রোগে মৃত প্রাণিকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাপ্ত কলিচুন সহযোগে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে। আক্রান্ত মৃত পশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় পশুর নাক, মুখ, পায়ুপথ ও মলদ্বার তুলা বা কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। আক্রান্ত গরুর গোয়াল ঘর কাপড় কাচার সোডা বা ব্লিচিং পাউডার বা পটাশিয়াম-পার ম্যাঙ্গানেট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আক্রান্ত প্রাণিকে ভ্যাকসিন দেয়া হলে আবার ভ্যাকসিন দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সুস্থ প্রাণি ভ্যাকসিন দেয়া থেকে বাদ পড়লে প্রাণিকে অবশ্যই ভ্যাকসিন দিতে হবে। গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখতে হবে, যেসব প্রাণি এরই মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেসব প্রাণিকে ভ্যাকসিন দিয়ে কোনো লাভ হবে না। অর্থাত্ এ রোগে প্রাণি যখনই আক্রান্ত হোক না কেন সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে কোনো লাভ হবে না। আক্রান্ত প্রাণিকে অবশ্যই সুস্থ প্রাণি ও মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। এছাড়া স্থানীয় প্রাণিসম্পদ চিকিত্কদের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে।